ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা

ডা. এম মামুন

১৪ নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ১৪ নভেম্বর আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস দিবস পালিত হয়ে আসছে। বর্তমান সরকার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন (আইডিএফ) ২০২০ সালের বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসের জন্য থিম নির্ধারণ করেছেন, "The Nurse and Diabetes" এ বছরের প্রতিপাদ্য ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে নার্সের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে পারলে ডায়াবেটিসের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পৃথিবীতে সবচেয়ে উদ্বেগজনক ১০টি স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে অন্যতম ডায়াবেটিস। পৃথিবীতে এ মুহূর্তে ৪০ কোটি লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। বাংলাদেশে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৯০ লাখ, বছরে বাড়ছে আরও ১ লাখ রোগী। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশনের মতে, প্রতি দুজন ডায়াবেটিস আক্রান্ত মানুষের মধ্যে একজন জানেই না সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াবেটিস আক্রান্ত মানুষের আকস্মিক মৃত্যুর আশঙ্কা একজন সুস্থ মানুষের চেয়ে ৫০ ভাগ বেশি। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, আগামী ৩০ সালের মধ্যে বিশ্বে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা ৫৫ কোটি ছাড়িয়ে যাবে এবং ২০৪০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী মানুষের মৃত্যুর পঞ্চম কারণ হবে ডায়াবেটিস। আর তখন মৃত্যু বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে।

ভালো স্বাস্থ্য সুস্থ জীবনের প্রতীক। ডায়াবেটিস রোগের বিষয়ে সচেতনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ নাগরিকের সুস্বাস্থ্যের অভাবে দেশের উৎপাদনশীলতা কমে যায় এবং এটি উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায়। এজন্য সরকার দেশব্যাপী স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও নার্স নিয়োগসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে বিভিন্ন অসংক্রামক ব্যাধিসহ ডায়াবেটিক রোগ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এ জটিলতায় বাংলাদেশে মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের ঝুঁকি দিনে দিনে বাড়ছে।

শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি এই ছয় প্রকার খাবারের মধ্যে শেষের তিনটি পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। স্নেহ জাতীয় খাবার পরিপাক শেষে বিভিন্ন প্রকার লিপিড ও গ্লিসারাইড তৈরি করে যা শরীরে আত্তীকৃত হয়। আমিষ হতে বিভিন্ন এমাইনো এসিড তৈরি হয়ে দেহে আত্তীকরণ ঘটে। পরিপাক শেষে শর্করা গ্লুকোজ বা সুক্রোজে রুপান্তরিত হয়। অপেক্ষাকৃত সরল আনবিক গঠনের গ্লুকোজ দেহে শোষিত হয়। শ্বসন প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ ভেঙ্গে কার্বনডাই অক্সাইড, পানি ও শক্তি উৎপাদন কর। গ্লুকোজের জারণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তিই মূলত মানুষ এবং সমস্ত প্রাণিদেহের সকল শক্তির যোগান দেয়। স্নেহ জাতীয় খাবারও দেহে শক্তি যোগায়, তবে এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা একটু জটিল এবং সময় সাপেক্ষে। মানবদেহে জরুরি প্রয়োজনে শক্তির যোগান দিয়ে থাকে গ্লুকোজ।

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় বস্তু পরিপাক হয়ে সরাসরি শ্বসন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় না। শর্করা জাতীয় খাবার পরিপাক শেষে বিশ্লিষ্ট হয়ে অপেক্ষাকৃত সরল আনবিক গঠন বিশিষ্ট গ্লুকোজ অনু উৎপন্ন করে। এই গ্লুকোজ পাকস্থলীর ক্ষুদ্রান্তে শোষিত হয়ে রক্তরস দ্বারা বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছায় এবং শ্বসন প্রক্রিয়ায় জারিত হয়ে শক্তি উৎপাদন করে। বাড়তি গ্লুকোজের কয়েক হাজার অনু একত্রিয় হয়ে গ্লাইকোজেন ও স্টার্চ নামক গ্লুকোজের পলিমার গঠন করে। গ্লাইকোজেন ও স্টার্চ লিভার/যকৃতে সঞ্চিত থাকে এবং দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী পুনরায় রক্তে প্রবেশ করে এবং শ্বসন প্রক্রিয়ায় শক্তি তৈরিতে অংশ নেয়। গ্লুকোজ হতে গ্লাইকোজেন বা স্টার্চ (গ্লুকোজের পলিমার) গঠনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে অগ্নাশয় নিঃসৃত হরমোন ইনসুলিন। যাদের অগ্নাশয়ে ইনসুলিনের উৎপাদন হ্রাস পায় বা বন্ধ হয়ে যায় তাঁদের রক্তের গ্লুকোজ হতে গ্লাইকোজেন বা স্টার্চ উৎপাদনও ব্যহত হয় অথবা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাড়তি সুগার/গ্লুকোজ লিভারে সঞ্চিত না হয়ে রক্তেই থেকে যায়। ফলে রক্তরসে গ্লুকোজ/সুগারের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এই অবস্থাকেই বলা হয় ডায়াবেটিস। আমাদের শরীরে সাধারণত গ্লুকোজের পরিমাণ ৩.৩ থেকে ৬.৯ মিলি. মোল/লি. থাকে। খালি পেটে যদি ৭ মিলি. মোল/লি. এবং খাবার গ্রহণের পর ১১ এর বেশি থাকে তবে ডায়াবেটিস রোগ আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

ডায়াবেটিস রোগটি যে-কোনো বয়সের মানুষের হতে পারে। ডায়াবেটিস রোগ হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান থাকে যেমন- ঘন ঘন প্রসাব হওয়া, মুখ ও গলা শুকিয়ে যাওয়া; দুর্বলতা, ক্ষুধা লাগা, ওজন কমে যাওয়া, কিডনি, চোখসহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জটিলতা দেখা দিতে পারে। ডায়াবেটিস রোগীর শারীরিক জটিলতা অনেক তবে এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যসম্মত জীবনাচরণের এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রেখে কর্মমুখর জীবনযাপন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

ডায়াবেটিস আক্রান্ত হলে সর্ব প্রথম খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন করতে হবে। সাথে সাথে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এ রোগে আক্রান্ত হলে রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এজন্য প্রথমেই দরকার কার্বোহাইড্রেট/শর্করা জাতীয় খাবার যেমন মিষ্টি জাতীয় খাবার, ভাত, আলু, সুজি, রুটি ইত্যাদি খাবার পরিমাণ মতো খেতে হবে। মিষ্টি জাতীয় খাবার একেবারেই পরিহার করা উচিৎ। পক্ষান্তরে বেশি করে শাক সবজি ও ফলমূল খেতে হবে। আঁশ জাতীয় খাবার বেশি খেতে হবে। তেল ও চর্বি জাতীয় খাবার ও ফাস্ট ফুড ও কোল্ড ড্রিংকস পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপন এ রোগের ক্ষতিকর প্রভাব হতে আমাদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম।

ডায়াবেটিস অনিরাময়যোগ্য কিছু নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগ। এ রোগে একবার আক্রান্ত হয়ে তা আর ভালো হয় না। কিন্তু নিয়ন্ত্রত খাদ্যাভ্যাস, সঠিক চিকিৎসা, পর্যাপ্ত কায়িক শ্রম এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে রাখতে পারে সুস্থ এবং করতে পারে দীর্ঘায়ু। ডায়াবেটিসের সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয় অতিরিক্ত মানসিক চাপ, কম শারীরিক পরিশ্রম, বড়ো ধরনের আঘাত, সংক্রামক রোগ, অস্ত্রোপাচার, অসম ও অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, অবেসিটি বা স্থূলতা এবং বংশগত কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। মিষ্টি জাতীয় খাবার পরিহার করা বাঞ্চনীয় কিন্তু মিষ্টি জাতীয় খাবার এ রোগের কারণ নয়।

ডায়াবেটিসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটির ক্ষেত্রে এই ধরনের রোগীর দেহে ইনসুলিন একেবারেই তৈরি হয় না। সাধারণত ৩০ বছরের কম বয়সে এটি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে রোগীর শরীর ক্রামান্বয়ে শুকিয়ে যেতে পারে এবং ইনসুলিন নিতেই হয়। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ৩০ বছরের বেশি বয়সে এ রোগ হতে পারে, এ রোগীর ক্ষেত্রে দেহে ইনসুলিন তৈরি হলেও অপর্যাপ্ত, তবে এ ধরনের রোগীর সবসময়ই ইনসুলিন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। ব্যায়াম, উপযুক্ত খাদ্যাভ্যাস, নিয়মমাফিক প্রাত্যহিক জীবনযাপনে নিয়ন্ত্রণে থাকা সম্ভব। এ ধরনের রোগীরা স্থূলকায় হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও জেনেটিক কারণে, অগ্নাশয়ের বিভিন্ন রোগের কারণে এ রোগ হতে পারে, এ সব কারণে ডায়াবেটিস যাদের থাকে তারা অপুষ্টিতে ভোগে এবং ধীরে ধীরে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে। আরেক ধরনের ডায়াবেটিস হয় গর্ভকালীন সময়ে প্রসূতিদের ক্ষেত্রে। বেশির ভাগ সময়ে এ ডায়াবেটিস প্রসবের পর থাকে না। তবে এক্ষেত্রে ভ্রুণের সদ্য প্রসূত সন্তানের ক্ষতি হতে পারে।

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের ফলে মানুষ পাক্ষাঘাত, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ, পঁচনশীল ক্ষত, মাড়ির প্রদাহ, অ্যাকজিমা, মুত্রাশয়ের রোগ, কিডনি জটিলতাসহ নানা ধরনের রোগ হতে পারে। বর্তমান বিশ্বে ডায়াবেটিস নিঃসন্দেহে মারাত্মক তবে ছোঁয়াচে নয়। আগে একসময় ঘন ঘন প্রস্রাব হলে ডায়াবেটিস হয়েছে বলে ধরে নেয়া হতো। গবেষণায় এটি ভুল প্রমাণিত। কেবল রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা করেই রোগ শনাক্ত করা সম্ভব। ডায়াবেটিস রোগীর দেহে যে-কোনো ক্ষত শুকাতে সময় লাগে। সবচেয়ে বেশি ক্ষত হয় পায়ে। ডায়াবেটিস রোগীর ব্রেইন স্ট্রোক হয়, কিডনি, চোখ ইত্যাদি অঙ্গের ক্ষতি হয় তবে পায়ের যত্ম করতে হয় বেশি, কারণ পচন শুকাতে দেরি হয় বলে সাধারণ মানুষের তুলনায় পা কেটে ফেলার প্রবণতা থাকে বেশি। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণের তারতম্যে ডায়াবেটিস কম-বেশি হয়। খুব বাড়লে হাইপার এবং কমে গেলে হাইপো বলা হয়। দুটোই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি। ইনসুলিন যারা নিয়ে থাকেন তাদের অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে ডোজ নির্ধারণ করে নিতে হবে।

সরকার ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদের যথাযথ চিকিৎসায় সর্বদা তৎপর রয়েছে। সরকারি হাসপাতালে ভর্তি ডায়াবেটিস রোগীদেরকে বিনামূল্যে ইনসুলিন সরবরাহ করা হচ্ছে। সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র হতে হাসপাতালে ভর্তি নন এমন রোগীদেরকে হ্রাসকৃত মূল্যে ইনসুলিন দেওয়া হচ্ছে। এ রোগে আক্রন্তদের বিনামূল্যে চিকিৎসার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং করা হচ্ছে যেন তারা নিজেরাই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। বারডেম এর আদলে দেশের বিভিন্ন জেলায় ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এ রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়াধীন স্বাস্থ্যশিক্ষা বিভাগ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডায়াবেটিক রোগীদের সেবায় নেয়া হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা।

ডায়াবেটিস একটি নীরব ঘাতক। সরাসরি এ রোগে মানুষের মৃত্যুর হার তুলনামূলক কম হলেও পরোক্ষভাবে এর কারণে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে বিশ্বব্যাপী। কারণ এর প্রভাবে দেহে হাজারো রোগ বাসা বাঁধে। এসব রোগেই মূলত মারা যায় ডায়াবেটিস রোগী। হাজারো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পরিমিত আহার, নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত ব্যায়াম ও কায়িক শ্রম, সর্বোপরি সঠিক চিকিৎসা ডায়াবেটিস রোগীকে রাখতে পারে অনেকটাই সুস্থ এবং এনে দিতে পারে দীঘায়ু জীবন। প্রতিকার নয়, প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণই এ রোগের সর্বোত্তম চিকিৎসা। সচেতনতাই পারে মানুষকে এ রোগের যন্ত্রনা থেকে মুক্ত করতে।

#

০৮.১১.২০২০ পিআইডি ফিচার